প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষে কবিতা চর্চা প্রসঙ্গ

রাজর্ষি মহাপাত্র

প্রাচীন ভারতে সাহিত্যের অগ্রগতির ইতিহাসকে দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা যায়। প্রথম অধ্যায় খৃঃপূঃ চতুর্থ শতাব্দী থেকে খৃঃ তৃতীয়
শতাব্দী বিস্তৃত গুপ্ত-পূর্ব যুগ, এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে খৃঃ চতুর্থ শতাব্দী থেকে খৃঃ ষষ্ঠশতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত গুপ্ত যুগ।
সাতবাহন যুগে প্রাকৃত ভাষার বিশেষ ঘটেছিল। মৌর্য সম্রাটেরা প্রাকৃত ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। সাতবাহন রাজা হ াল প্রাকৃত ভাষায় ৭০০ গাথা বা গাথা সপ্তশতীর সঙ্কলন করেন। গাথা সপ্তশতীতে বিভিন্ন ভাবের গাথা বা কবিতার সঙ্কলন দেখা যায়। কোনটি চটুল, লঘু, কোনটি বিষাদে মলিন, আবার কোনটি দার্শনিক ভাবে উদ্দীপ্ত। মহারাজ হালের আগে জনৈক কবি যাঁর নাম ছিল কবি বৎসতন তাঁর সঙ্কলনের ওপর নির্ভর করে হাল এই গাথা সঙ্কলন করেন। মারাঠী গীতি কবিতার কথা গাথা সপ্তশতী থেকে বোঝা যায়।

সাধারণভাবে গুপ্তযুগের সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতির স্মৃতি জড়িত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গুপ্ত পূর্ব যুগেও সংস্কৃত ভাষা ও স াহিত্যেরবিশেষ উন্নতি হয়েছিল। তবে এ যুগের সাহিত্যিক প্রয়াস শুধু সংস্কৃত ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তখন সংস্কৃতের প্রাধান্য ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত হলেও তার পাশাপাশি পালি, অর্ধ-মাগধী এবং প্রাকৃতে উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্ট হয়েছিল। এ যুগের সাহিত্য প্রয়াস উত্তর ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। দক্ষিণ ভারতের তামিল ভাষায়ও আকর্ষণীয় সা হিত্য রচিত হয়েছিল। তবে সংস্কৃতের তুলনায় তামিল ভাষায় রচিত সাহিত্যের পরিমাণ কম এবং ধীরে ধীরে উত্তর ভ ারতের সংস্কৃত ও সাহিত্য তামিল সাহিত্যকে আচ্ছন্ন করেছিল।

এই সময় পতঞ্জলির রচনায় গভীর, ব্যাপক এবং মার্জিত কাব্য চর্চার পরিচয় পাওয়া যায়। পতঞ্জলি বহুসংখ্যকগীতি কবিত া এবং প্রেমবিষয়ক ও নীতিবাক্য সমন্বিত অসংখ্য শ্লোকের কথা বলেছেন। নানা প্রকার আখ্যান এবং আখ্যায়িকা ছাড়াও বিচিত্র ধরণের ছন্দের উল্লেখ তিনি করেছেন। সাধারণভাবে পিঙ্গল থেকে ছন্দবিজ্ঞানের সূচনা হয়েছিল বলে মনে করা হয়। তাঁর রচিত ছন্দসূত্র গ্রন্থটিকেবেদাঙ্গের মর্যাদা দেওয়া হয়। তবে তিনিই প্রথম ছন্দচর্চা শু করেন, এই ধারণা ঠিক নয়। কেননা তিনি নিজেই এবিষয়ে তাঁর পূর্বসূরী রাত, মান্ড্য, কাশ্যপ প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। সামবেদের ছন্দ সম্পর্কিত অ ালোচনা, নিদানসূত্র, পতঞ্জলির রচনা বলে মনে করা হয়। সর্বোপরি পতঞ্জলির মহাভাষ্যে কাব্য সাহিত্যের ধারাবাহিকত ার আভাস বার বার পাওয়া যায়। এই কাব্যসাহিত্যের মহত্তম দৃষ্ট
ন্ত নিঃসন্দেহে রামায়ন এবং মহাভারত। ভারতীয় জীবনে এই প্রভাব স্থায়ী হয়েছিল। পরবর্তী সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্য তার অ াকার এবং বিষয়বস্তুর জন্য মহাকাব্য দুটিকে আদর্শরূপে গ্রহন করেছিল। এ যুগে সংস্কৃত সাহিত্য সৃষ্টি কেবল ব্রাহ্মণরাই করেন নি, বৌদ্ধরাও করেছিলেন। বৌদ্ধগন তাঁদের ধর্ম প্রচারের মাধ্যম হিসেবে সংস্কৃতের উপযোগিতা ক্রমশ উপলব্ধি করেন।

সংস্কৃত কাব্য বিষয়ে কিছু আলোচনার পর কাব্য সমালোচনা বিদ্যা অথবা কাব্যতত্ত্বের কথা বলা যায়। কাব্যশাস্ত্রে কবিদের চিন্তাকবি, সৃত্তকবি, অর্থকবি, এবং প্রতিভাবান কবি, এই চার শ্রেণীত ভাগ করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে সমালে াচকের দৃষ্টিতে সাহিত্যবিচার তখন কিছুদূর অগ্রসর হয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে পালি ভাষায় রচিত সাহিত্যের গুত্ব অপরিসীম। কেননা বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলির বেশিরভাগ পালি ভাষায় রচিত। বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক, গদ্য ও পদ্যে রচিত শ্রেষ্ঠ সা হিত্য সৃষ্টি সূত্রপিটকের অন্তর্ভুত্ত। আবার বুদ্ধের পূর্বজন্ম অবলম্বনে রচিত জাতকের সংখ্যা পাঁচশোর বেশী। এগুলিতে লৌকিক বৌদ্ধ ধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। জাতকের পদ্য ও গদ্যাংশের অংশ-বিশেষ বুদ্ধের সমকালীন। পদ্যাংশের বেশীরভাগ সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ববর্তী নয়, এবং গদ্যাংশের বেশীরভাগের রচনাকাল খ্রীষ্টীয় শতাব্দীতে।

পশ্চিম ভারতে ব্রাহ্মণ লেখকগন তখন তাঁদের রচনায় দুই শ্রেণীর প্রাকৃত ব্যবহার করতেন, একটি সৌরসেনী প্রাকৃত অন্যটি মহারাষ্ট্রীপ্রাকৃত। এই মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে গীতি কবিতা রচিত হয়েছিল। গাথাসপ্তশতী গ্রন্থটিতে প্রাকৃত ও সংস্কৃত প্রেমের কবিতার উপর প্রভাব খুব বেশী। মূলত প্রেমের কবিতার সঙ্কলন হলেও, এর বিষয়বস্তু যে শুধুমাত্র প্রেম, তা বলা চলেনা। এতে সুন্দর প্রকৃতি বর্ণনা এবং মনুষ্যচরিত্র সম্পর্কে উত্তম মন্তব্য আছে।

ইতিহাস-পুরাণ তখন জনশিক্ষার বাহন রূপে স্বীকৃতি পেয়েছিল। কৌটিল্য এবং পতঞ্জলির রচনা থেকে জানা যায় যে মৌর্য ও শুঙ্গযুগেপুরাণ থেকে আবৃত্তি করা হত। তৎকালীন কবিগন পুরাণের উপর নির্ভর করতেন।

গুপ্ত যুগে সাহিত্যের বিশেষ বিকাশ হয়েছিল। এলাহাবাদ প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্তকে 'কবিরাজ' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। গুপ্তযুগে ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃত সাহিত্য প্রসঙ্গে কবি এবং প্রধান নাম নিঃসন্দেহে কালিদাস। তাঁর পরেও গুপ্তযুগের ছায়ার কিছু লেখক অর্থাৎ কবি উল্লেখ যোগ্য সৃষ্টি করেছিলেন। এঁরা হলেন ভারবি এবং মাঘ। অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের কবিদের মধ্যে প্রথমেই বুদ্ধঘোষের নাম করতে হয়। এছাড়া ছিলেন ভট্টি এবং ভৌমক।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এক নতুন ধরণের কবিতা লিখিত হয়েছিল। একশোটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্তবক দ্বারা রচিত বলে এই কবিতাগুলিকে 'শতক' বলা হত। ভর্ত্তৃহরি রচিত শৃঙ্গাঁরশতক, নীতিশতক এবং বৈরাগ্যশতক সমধিক প্রসিদ্ধ। সুন্দর এবং বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গি এইশতক গুলির অন্যতম বৈশিষ্ঠ্য। তাছাড়া সংস্কৃত কবিতায় কবিব্যত্তিত্বের যে পরিচয় সচরাচর দুর্লভ, ভর্ত্তৃহরির কবিতায় তা পাওয়া যায়। তাঁর প্রেমের কবিতাগুলিতে অন্তর্লীন অতৃপ্তি সহজেই ধরা পড়ে। স্পষ্ট বোঝা যায় যে রমনীর প্রেমে মুগ্ধ মুহূর্তগুলিতে তিনি ধর্মীয় জীবনের আহ্বান শুনতে পেতেন। তাঁর এই ঈশ্বরচেতনাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছিল।

ভর্ত্তৃহরির মনে রমণীর প্রেম সম্পর্কে যে সংশয় ছিল, অমশতকের কবি অমর মনে তা ছিল না। তাঁর কবিতাগুলি ছিল অধিকতর ইন্দ্রিয়পরায়ণ। এছাড়া আরো দুটি 'শতকে'র কথা বলা যায়, একটি ময়ূরশতক এবং অন্যটি দেবীশতক। ময়ূরশতকের লেখক ময়ূর এবং দেবীশতকের লেখক বান, উভয়েই হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক ছিলেন।

বরাহমিহির নিজে অনেক পদ্য রচনা করেছিলেন। তিনি তাঁর বৃহৎ-সংহিতা গ্রন্থে বিবিধ প্রাচীন সংস্কৃত ছন্দের বহুল ব্যবহার করেছিলেন। সে যুগে যাঁরা সাধারণভাবে সংস্কৃত কবি, তাঁরাও ইতস্তত পালি ভাষায় গীতিকবিতা এবং বর্ণনামূলক কবিতা রচনা করেছিলেন। স্বয়ম্ভু রচিত ছন্দ বিষয়ক গ্রন্থে এই গীতিকবিতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ারদিকে প্র াচীনতম তামিল সাহিত্যের সূচনা হয়েছিল। তামিল অঞ্চলের চারনকবিগন দেশের সর্বত্র বিচরণ করতেন। তাঁরা যুগপৎ র াজন্যবর্গ এবং গ্রামীন মানুষের পৃষ্ঠপোষকতা লাভকরেছিলেন। মাঝে মাঝে তারা মাদুরাই নগরীতে অনুষ্ঠিত কবিতা ও সঙ্গ ীত উৎসবে যোগ দিতেন। "আট সঙ্কলনের" (এট্টুটোগাই) অনেক কবিতা সেই অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করা হত। তামিল অঞ্চলের বাইরের মানুষ এট্টুটোগাই-এর কবিতার কথা বিশেষ জানেনা । এর ভাষা এত প্রাচীন যে, আধুনিক কালের

শিক্ষিত তামিলও বিশেষ শিক্ষা ছাড়া তা পড়তে পারেনা। এই কবিতাগুলির পিছনে নিশ্চয়ই তামিলকবিতার সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ছিল। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র তামিলভূমিতে আর্য প্রভাব বিশেষ ভাবে অনুপ্রবেশ করেছিল। এর ফলে সেখানে সংস্কৃতের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তামিল কবিতার নিজস্ব রীতি বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল।

পাল আমলের সাহিত্যে ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের কথা বলা যায়। এ বিষয়ে একটি পুঁথির সংবাদ পাওয়া গেছে। উত্তর রাঢ়নিবাসী নারায়ণ কেশব মিশ্রের ছান্দোগ্য-পরিশিষ্টের টীকা হিসেবে এই পুঁথি লিখেছিলেন।

তৎকালীন কাব্য রচয়িতাদের মধ্যে গৌড় রচয়িতাদের মধ্যে গৌড় অভিনন্দ নিঃসন্দেহে বাঙালী ছিলেন। তিনি পদ্যে কাদম্বরী কথাসার নামে একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। তাঁর কয়েকটি শ্লোক বাসর্ঙ্গধর রচিত সঙ্কলন গ্রন্থে, এবং শ্রীধর দাসের সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে পাওয়া গেছে। পাল আমলের সুপরিচিত কবি, 'রামচরিত' নামক ঐতিহাসিক কাব্যের রচয়িতা সন্ধ্যাকর নন্দী। এছাড়া 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' নামে একটা কবিতা সঙ্কলন পুঁথি পাওয়া গেছে।

সেন রাজারা সকলেই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বল্লালসেন, লক্ষণসেন এবং কেশবসেন নিজেরা কবি ছিলেন, এবং কবিজনের পোষকতা করতেন।গোবর্ধন, শরণ, জয়দেব এবং উমাপতিধর লক্ষণসেনের রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। এঁরা ছাড়া সদুক্তিকর্ণামৃত নামক সঙ্কলন গ্রন্থে অনেক কবির সন্ধান পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, এই পর্বের সংস্কৃত গীতিকবিতায় বাঙালী কবিদের অবদান গুণ ও পরিমানের দিক থেকে বিশেষ স্মরণীয়। তবে রাজসভাকেন্দ্রিক এ যুগের কবিতার সহজ সৌন্দর্য আছে, কিন্তু প্রাণের প্রচুর্য এবং ভাবের গভীরতা নেই।
সুলতানি যুগে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম-সংস্কারের যে আন্দোলন 'ভক্তিবাদী' ও সুফীবাদীরা শু করেছিলেন, তার ফল হয়েছিল সুদূর প্রসারী। এই সংস্কার হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন চমৎকারভাবে যোগসূত্র স্থাপন করে, যার ফলে পরস্পর পরস্পরকেজানতে ও বুঝতে সচেষ্ট হয়। স্বভাবতই, ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও উভয়ের ভাবধারা সম্মিলিত হয়ে এক নতুন ভাবধারার সুচনা করে।

তাছাড়া আপাতদৃষ্টিতে রাজনীতি ও সংস্কৃতি সম্পর্ক বিহীন মনে হলেও দুই এর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধইতিহাস বারবারই প্রমান করেছে। মুসলিমদের আগমনে এদেশের রাষ্ট্রীয় পালা বদল ঘটেছিল, সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন উপাদানে সমৃদ্ধ হয়েছিল ভারতবর্ষ। তুর্কী বিজেতাদের আগমনের সূত্রে আরবী ও ফারসী (পারসিক)-এই দুটো নতুন ভাষার লঙ্গে ভারতবাসী পরিচিত হয়েছিল। দেশীয় ও বিদেশীয় ভাষায় সংমিশ্রণে যেমন জন্ম নিয়েছিল নতুন উর্দুভাষা, তেমনি ভারতীয় সাহিত্য সম্ভারে যুক্ত হয়েছিল আরবী ও ফারসী সাহিত্য। রাষ্ট্রীয় পট পরিবর্তনের ফলে ব্রাহ্মণদের অবসান ঘটেছিল বলে বিবেচ্য যুগে সংস্কৃত ভাষা তার আগেরকার কৌলীন্য হরিয়েছিল। কিন্তু বহিরাগতের জামানায় সমৃদ্ধি লাভ করেছিল আঞ্চলিক সাহিত্য। প্রকৃতপক্ষে ভারতে বর্তমানে প্রচলিত আঞ্চলিক ভাষাসমূহের উৎপত্তিকাল এই সুলতানী যুগ।

আরবদের সঙ্গে ভারতবাসীর দীর্ঘদিনের পরিচয় থাকবার ফলে ঐ ভাষা ভারতীয়দের কাছে একেবারে নতুন ছিলনা। সুলতানী আমলে আরবী ভাষা মূলতঃ ইসলামীয় পন্ডিত সমাজের মধ্যেই সীমিত ছিল। তুর্কীদের ভারত-আগমনের সূত্রে ভারতবাসী যে সম্পূর্ণ নতুন এক ভাষার সঙ্গে পরিচিত হয় তা হল পারসিক বা ফারসী। সুলতানী যুগে, এদেশে মধ্য এশিয়া থেকে পন্ডিত ব্যক্তিদের সমাবেশের ফলে ফরসী ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। তাছাড়াও আরও একটা বড় কারণ হল এই যে, তুর্কী-আফগান শাসকরা গোড়া থেকেই ফারসীকে সরকারী ভাষায় মর্যাদা দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষে ফারসী ভাষা ও সাহিত্য চর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল লাহোর।

দিল্লী সুলতানী যুগে ফারসী কবিদের মধ্যে আমীর খসর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। তিনি কাব্যরীতি সম্পর্কে নানা পরীক্ষা

নিরীক্ষা করে এক নতুন ফারসী কাব্যরীতির প্রবর্তন করেছিলেন যা 'সবক-ই-হিন্দ' নামে অভিহিত। আমীর খস ভারতীয় ভাষা সম্পর্কেও সমানভাবে উৎসাহী ছিলেন। শোনা যায় তিনি হিন্দীতে কবিতা রচনা করেছিলেন। খসই প্রথম ফারসিক ছন্দে তাঁর প্রিয় হিন্দিতে দুই পংক্তির কবিতা রচনায় সচেষ্ট হয়েছিলেন।

পঞ্চদশ শতকে প্রধানতঃ সন্ত কবীরের প্রভাব ও অনুপ্রেরণা হিন্দীভাষা ও সাহিত্য প্রসারিত হয়েছিল। অনেক কবিতা ও দোঁহা কবীরেরনামে প্রচলিত আছে যাদের মূল রচনার সঙ্গে মিল নেই। এই সব কবিতার ভাষা কবীরের মূল কাব্যের এক অংশের ভাষা ভোজপুরী হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভোজপুরী ভাষায় রচিত হবার পরে ব্রজ ভাষা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। ব্রজভাষা ও দিল্লী অঞ্চলের কথা ভাষার সঙ্গে মিলিত হওয়াতে সমগ্র উত্তর ভারতে কবীরের কবিতাও দোঁহা জনপ্রিয়তা লাভ করে। এইসব কাব্য পাঞ্জাব এবং বিহারেও জনগণের কাছে প্রিয় ছিল। মানদেব মারাঠী ভাষা ও সাহিত্যকে অনুরূপ ভাবে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী করে যান। নানক ও তাঁর শিষ্যরা গুরমুখী ওপাঞ্জাবী ভাষাকে নতুন রূপ দান করেন এবং বাংলাভাষা ও সাহিত্য শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগামীদের দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হয়। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস তাঁর সুললিত গীতিকাব্যের মাধ্যমে আজও বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে অমর হয়ে আছেন। চণ্ডীদাসেরসমসাময়িক মিথিলার কবি বিদ্যাপতিও তাঁর অপরূপ কাব্যপ্রতিভার মাধ্যমে বাঙ্গালীর হৃদয়ে চিরস্থায়ী হয়ে আছেন। এসব কবিরা রাজানুগ্রহ লাভ করার ফলে তাঁদের প্রতিভাস্ফুরণে বিশেষ সুবিধে হয়।

উল্লেখ্য, আমীর খসর পর এ যুগে যে মুসলমান কবির নাম করতে হয় তিনি হলেন শেখ নজম্ উদ্দিন হাসান তবে তিনি হাসান-ই-দিলভী নামেই বিশেষ পরিচিত ছিলেন। ভারতের বাইরেও তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল।

জৈন অপভ্রংশ সাহিত্যের ঐতিহ্য গুজরাটের ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির পথ প্রশস্ত করেছিল। গুজরাটের সন্ত, পন্ডিত ও বৈয়াকরনিক জৈনশাস্ত্রজ্ঞ হেমচন্দ্র (১০৮৮ — ১১৭৩) সমসাময়িক অপভ্রংশ থেকে প্রায় একশত দুইটি চরণের সংকলন করেছিলেন। বিজয়নগর সাম্রাজ্য ষোড়শ শতকে কৃষ্ণদেবরায়দের রাজত্বকালে গৌরবের চরম শিখরে উঠেছিল। কৃষ্ণদেব রায়ের রাজসভায় তেলেগু সাহিত্যের অষ্টাদিগ্গর্জ বা কবি অলংকৃত করেন। প্রসিদ্ধ তেলেগু লেখক পোড্ডন কৃষ্ণদেব রায়ের সভাকবি ছিলেন। সুলতানী যুগেই 'মনসামঙ্গল' কাব্য পরিণত রূপ গ্রহণ করেছিল। বিপ্রদাস পিপিলাই মনসামঙ্গলের প্রথম কবি।

মুঘল রাজসভাকে কেন্দ্র করে সাহিত্য-সংস্কৃতির যে অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে কোন সুস্থ ও নিরপেক্ষ সমালোচকের পক্ষে মুঘল যুগীয় ভারতবর্ষকে শুধুমাত্র রাজতান্ত্রিক ক্ষমতার দম্ভপ্রকাশের ক্ষেত্র হিসেবে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। প্রবল প্রতাপান্বিত একক স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রে যুগে সম্রাট বা বাদশার আন্তরিকতা ব্যতীত সুকুমার কলার স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব নয়। তৈমুর বংশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রতিভাত হয়েছে ভারতবর্ষে তাঁর উত্তরসূরীদের মধ্যে। বাবর, আকবর, শাহজাহান প্রমুখ বাদশাহ যেমন সাহিত্য-সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, কেউ কেউ নিজেই সৃষ্টি করেছেন অমূল্য সাহিত্য, কাব্য ইত্যাদি, তেমনি একাজে এগিয়ে এসেছেন গুলবদনবেগম, নূরজাহান, জেবউন্নিসা প্রমুখ রাজঅন্তপুরচারিণীগণ শিল্প-সাহিত্যের রাজ্যকে করেছেন সমৃদ্ধ। আবার ক্ষমতাবান কোন কোন অভিজাত, যেমন অব্দুর রহিম খান-খানম, যুদ্ধ বা কূটনীতির জাদুকর হওয়া সত্ত্বেও, জনমানসে আসন স্থায়ী করেছেন তাঁদের সাহিত্য-মনস্কতার কারণে।

মুঘল আমলে সাহিত্যের অঙ্গন সুসজ্জিত হয়েছে সংস্কৃত, হিন্দী, আরবী, উর্দু, ফারসী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় রচিত গ্রন্থরাজিতে। তবে ফারসী সাহিত্যের চর্চায় যে প্রাণপ্রবাহ ছিল, তা এক কথায় অনবদ্য এবং সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতক জুড়ে ভারতে এসেছেন বহুপারশিক পণ্ডিত। এঁদের মধ্যে কবিরাও ছিলেন। আগাগড়া ভারতীয় রীতি-নীতির সাথে সম্পর্কিত হয়ে জন্ম দিয়েছেন ইন্দো-পারসিক সাহিত্য ধারার। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের ফারসী ভাষায় রচিত

কবিতা সংকলন 'মাথনবি-ই-মুবিন' খুব বিখ্যাত। ফারসী ভাষায় কবিদের পৃষ্ঠপোষণার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন উদারমনা। ফারগি, নাদির স্বমরখন্দি, আতিশি কান্দাহার, তাহির খাওয়ান্দি, মোল্লাসাহেব, শেখ জৈনউলদিন প্রমুখ ফারসী কবি-সাহিত্যিক বাবরের পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করেছিলেন। বাবরের মত হুমায়নও কবি ওকবিতার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। পারস্যের প্রতি ছিল তাঁর গভীর টান। তিনি নিজে ফারসী ভাষায় লিখেছেন 'দিওয়ান' এবং উৎসাহিত করেছেন শেখ আমানুল্লা, মৌলানা জালালী, মীরওয়াইসি, কাশিম খান মৌজি'র মত প্রখ্যাত ফারসী ভাষার কবিদের। আকবরের সিংহাসনে আরোহনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রের মত ফারসী সাহিত্যের অঙ্গনেও জোয়ার আসে। আবুল ফজলের মতে প্রায় একহাজার কবি-প্রতিভা আকবরের রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন। এঁদের মধ্যে দুটি সুবিখ্যাত নাম হল গাজালী মাসাদি এবং ফৈজী। গাজালীর কয়েকটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ হল 'মিরাত-আল-সিফৎ' নাকস্-ই-বাদি', 'মাসাদ-ই-আনোয়ার' ইত্যাদি। শিবলী নোমানীর মতে ফৈজীকৃত কাব্যকর্মের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হল 'তবাশির-উল-সুবহ', এছাড়া 'নল-ও-দমন', 'সওয়ারিদ-ই-কালা', 'মারকজ-ই-আদব' প্রভৃতি ছিল তাঁর অন্যতম কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থ। আকবরের আমলে প্রভাবশালী অভিজাত আব্দুর রহিম খান-ই-খানান-এর পৃষ্ঠপোষকতায় আরফি সিরাজী, আব্দুল বাকি, নাজিরী নিসাপুরী প্রমুখ ব্যক্তি কাব্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। খান-ই-খানান এর কবিমন্ডলেরমধ্যে সর্বাধিক উজ্জ্বল নক্ষত্র ফিরোজী খান-ই-খানান এবং আকবরের কাছ থেকে তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ যে সব মহার্ঘ পুরস্কার পেয়েছিলেন, তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হলে একটা নতুন গ্রন্থ রচনা করতে হবে বলে তাঁরই সমসাময়িক কবি আব্দুল বাকি মত প্রকাশ করেছেন। জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহানও পিতৃপুষদের সাহিত্যধারায় অনুসারী ছিলেন। জাহাঙ্গীরের সময় তাঁর অর্থানকূল্যে কবিরা প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। নিশাপুরের নাশির ছিলেন জাহাঙ্গীরের রাজসভায় শ্রেষ্ঠ কবি। তালিব অমুলি ছিলেন তাঁর সভাকবি। শাহজাহানও কবি-সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এঁদের তিনি প্রচুর পরিমাণে অর্থ সাহায্যও করতেন। একজন ফরাসী কবি বর্ণনা দিয়েছেন এই বলে যে ভারত হল একমাত্র দেশ যেখানে কবিতা ও কাব্যের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব। শাহজাহানের আমলে হামাদান (ফারসী) থেকে আবু তালিব কালিম ভারতে আসেন এবং শাহজাহানের সভাকবি হন। তবে শাহজাহানের আমলে সবচেয়ে বড় ফারসী কবি ছিলেন মির্জা মুহম্মদ আলি সায়িব। তিনি ফারসী কবিতা রচনার ক্ষেত্রে এক নতুন আঙ্গিকের প্রবর্তন করেন। তিনিই চিত্রধর্মী ফারসী কবিতার প্রবর্তক। শাহজাহান তাঁকে 'মুস্তায়িদ খাঁ' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। শাহজাহানের আমলের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ফারসী কবি হলেন কাসিম খাঁ জয়াইলি, মীরমহম্মদ, হুসেন সার্কি এবং মহম্মদ হুসেন কসমী। ভারতীয়দের মধ্যে যেসব ফারসী কবি জনপ্রিয় হয়েছিলেন তাঁরা হলেন সাহিদা আকবরবাদী এবং হাদিক ফতেপুরী। সুফী কবি মার্যাদাও অতীন্দ্রিয়বাদী কবি হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। শাহজাহানের কন্যা জাহানারা বেগমও ছিলেন একজন খ্যাতনামা কবি। সুফী সাধক খাজা মঈনউদ্দীন চিস্তি সম্বন্ধে লিখিত 'মুনিশ-অল-আরওয়া' গ্রন্থে তাঁর পাণ্ডিত্য ও উচচশ্রেণীর কবি-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে সাহিত্য ক্ষেত্রে কালোমেঘ নেমে আসে। বাদশাহের আনুকূল্য থেকে কবিতা বঞ্চিতা হতে থাকে এবং ফারসী কবিতা তার মর্যাদা হারায়। তা সত্ত্বেও ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন পাটনার মির্জা আবুল কাদির বিদিল। কথিত আছে প্রায় একলক্ষ গীতি কবিতা তিনি রচনা করেছিলেন। বিদিল ভারতীয় হলেও তঁার কবি প্রতিভা ভারতের বাইরেও সমাদৃতহয়েছিল। ঔরঙ্গজেবের কন্যা জেবউন্নিসা বেগম ছদ্মনামে ফারসী ও আরবী ভাষায় উচচমানের কবিতা রচনা করেছিলেন। 'দিওয়ান-ই-মাক্ফি' গ্রন্থটি তাঁর কাব্যপ্রতিভার স্মারকচিহ্ হিসেবে গণ্য হয়।

মুঘলযুগে হিন্দু পণ্ডিতও সাহিত্যিকগণও ফারসী ভাষায় সাহিত্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁরা উচচমানের কবিতাও রচনা করেছিলেন। আকবরের সভাসদ ও উচচপদস্থ মানবদার রাজা টোডরমল ফারসী ভাষায় কবিতা রচনা করতেন। ঐতিহাসিক এস. এস. আইদুল্লার কথায়, আঠারো শতকের শেষার্ধে ফারসী সাহিত্যে হিন্দু লেখকদের ভূমিকা বা অবদান মুসলমান লেখকদের চেয়ে কোনমতেই কম ছিল না।

মুঘলযুগে ফারসী সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি হওয়ায় অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্য এর দ্বারা উপকৃত হয়। এর প্রভাবেই উর্দুভ

াষা সাহিত্যেরভাষা হিসেবে গণ্য হয়। দক্ষিণভারতে বিজাপুর, গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর ছিল উর্দু অনুশীলনের সুপ্রসিদ্ধ কেন্দ্র। গুজরাটের আলি মুহম্মদ জান গামোধানী এবং শেখ খুশ মহম্মদ বিখ্যাত উর্দু কবি ছিলেন। এই যুগের উর্দু লেখকদের মধ্যে হাতিম খাঁ ও আম্বের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মুঘলযুগের হিন্দী সাহিত্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। রাজা বীরবল, ভগবানদাস ও মানসিংহ সুকবি ছিলেন। আকবরের অ ামলে আবদুল রহিম নামে একজন ওমরাহ সংস্কৃত ও হিন্দীতে রসোত্তীর্ণ কবিতা লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। আকবর বীরবলের কবিপ্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'কবিপ্রিয়' উপাধি দেন। মুঘল যুগের হিন্দী ভাষায় সুরদাস, নন্দদাস, ভূষণ প্রমুখ কবিগন রাধাকৃষ্ণবিষয়ক গীতি কবিতা রচনা করেন। মুঘলযুগে সর্বশ্রেষ্ঠ হিন্দীকবি হলেন 'রামচরিত মানস' রচয়িতা তুলসীদাস।
মুঘলযুগে বাংলাভাষা ও সাহিত্যেরও বিশেষ উন্নতি ঘটে। দিল্লীতে তুর্কো-আফগান সুলতানদের শাসনকালের প্র াথমিকপর্বে বাংলা সাহিত্যের জগৎ ছিল খুবই নিষ্প্রভ। দ্বাদশ শতক ও পঞ্চদশ শতকের অন্তর্বর্তীকালে বাংলা ভাষায় মহান সাহিত্য সৃষ্টির নজির একান্তই বিরল। পঞ্চদশ শতকের বাংলা সাহিত্যের মরাগাঙে কিছুটা সজীবতা আনেন বিদ্য াপতি, চণ্ডিদাস এবং কৃত্তিবাস প্রমুখ কবি। ভারতে মুঘল শাসন শু হলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রের মতই সাহিত্য-সংস্কৃতির যুগেও পরিবর্তন সূচিত হয়। মুঘল শাসকদের সাহিত্যপ্রীতি এবং দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতার ফলে অন্যান্য ভাষার মত বাংলা ভ াষাতেও স্বাভাবিক সাহিত্য চর্চা শু হয়। আরবী বা ফরাসী ভাষার প্রসারে তাঁরা হয়ত ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগীছিলেন, কিন্তু সংস্কৃত বাংলা বা অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রে তাঁরা অনর্থক অনুদারতা দেখিয়েছেন, এমন অভিযোগও আনা অসম্ভব। আলে াচ্যপর্বে বাংলা সাহিত্য আবর্তিত হয়েছিল মূলতঃ শ্রীচৈতন্যর জীবনকর্ম এবং বৈষ্ণববাদকে ভিত্তি করে। মুঘল আমলে বিকশিত তথাকথিত বৈষ্ণব সাহিত্যের দুটি ধারা ছিল জীবনচরিত এবং পদাবলী সাহিত্য।

বৈষ্ণব পদাবলী রচনায় লোচনদাস, বাসুদেব ঘোষ, নরহরি সরকার, যশোরাজ খাঁ, কবিশেখর, নরোত্তম দাস, বলরাম ও জ্ঞানদাস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপলাই, নারায়নদেব, ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি কবিগন 'মনসামঙ্গল' ক াব্যের রচয়িতা। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি। 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন ঘনারাম। রামের ভট্টাচার্যের 'শিবায়ন' কাব্যটিও বাংলা সাহিত্যে একটি রসোত্তীর্ণ গ্রন্থ। কাশীরামদাস যে একজন উচচ শ্রেণীর কবি ছিলেন তা তাঁর রচিত মহাভারত পাঠ করলেই বোঝা যায়। উল্লেখ্য, সপ্তদশ শতকে বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান দু'জন কবি ছিলেন দৌলত কাজী এবং আলাওল।

মুঘল যুগে তেলেগু, তামিল, মালয়ালাম, কানাড়া ভাষা ও সাহিত্যেরও উন্নতি ঘটেছিল। অপরদিকে গুজরাটি, পাঞ্জাবী, সিন্ধী ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচিত হয়। গুজরাটি সাহিত্যের বিষয়বস্তু হল ভক্তিবাদ। মিরালবাঙ্গ ও নরসিংহ মেট্যা হলেন দুজন বিশিষ্টকবি যাঁরা বৈষ্ণবধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁদের কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। এই যুগের শ্রেষ্ঠ গুজরাটি কবি হলেন প্রেমানন্দ। তিনি ৫৭টি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। তাছাড়া তিনি গাথা ও গীতি কবিতাও রচনা করেছিলেন।

সবশেষে বলা যায় মুঘল যুগে কবিতা চর্চা তথা সাহিত্যের বিশেষ অগ্রগতি হয়। সাহিত্যের এই বিকাশের জন্যে মুঘল সম্র াটদের পৃষ্ঠপোষকতাই একমাত্র কারণ ছিলনা। বৈদেশিক আক্রমনের ভয় থেকে মুক্ত হয়ে এবং মুঘল সম্রাটদের ধর্মসহিষ্ণুত া নীতির প্রভাবে ভারতীয় লেখকদের সৃজনী ক্ষমতা বিকশিত হয়। তাছাড়া হিন্দু লেখকদের একমাত্র সংস্কৃত ভাষায় সা হিত্য রচনার প্রবণতা মুঘল যুগে লোপ পায়। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের কণ্ঠস্বর এ সময় মুখের ভাষায় লেখা সা হিত্যের মাধ্যমে শোনা যায়।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com